ইহলৌকিক এবং ব্যাবহারিক সর্বদিকের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিল। সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দীর্ঘজীবী করেছিল। তাই বৈদেশিক আক্রমণে এই শিক্ষার মূলতত্ত্ব ও সংগঠন ভেঙে পড়েনি। রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকায়, সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা থাকায়, শিক্ষকের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক ওত্থান-পতনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন হয়নি। শিক্ষার উপর শিক্ষকের পূর্ণ কর্তৃত্ব, গুরুকুল প্রতিষ্ঠা, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব, বেতনহীন শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে মর্যাদা, শিক্ষায় নারীর সমানাধিকার, শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক আধ্যাত্মিক বিকাশসাধন প্রভৃতির মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা (Buddhistic System of Education)

ভূমিকা (Introduction)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে আর-একটি গৌরবময় যুগ হল বৌদ্ধ শিক্ষার যুগ। গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রতিবাদ স্বরূপ যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাই ইতিহাসে **'বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা'** নামে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তন মাত্র। কারণ হিন্দুধর্মের গর্ভেই বৌদ্ধধর্মের জন্ম। প্রকৃতপক্ষে বাহ্মণ্য ধর্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না-ঘটিয়ে ওই ধর্মের সংস্কারসাধন করাই ছিল বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে হিন্দুধর্মের বহু তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মেও স্থান লাভ করেছিল। সুতরাং বলা যায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ পথবিচ্ছেদ নয়, পুরাতন হিন্দু ধর্ম থেকে উদ্ভূত নতুন পথনির্দেশ মাত্র। ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধই প্রথম সার্থক প্রতিবাদ করেন এবং ভারতবাসীর জীবনে ও ধ্যানধারণায় এক নতুন পথের সন্ধান দেন। ("It was Gautam Buddha who rose in open protest against the power and ritual of the Brahmanas and thus introduced a new force into Indian life and thought.")

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিহারকেন্দ্রিক বা সংঘভিত্তিক শিক্ষা। বৌদ্ধ মঠ বা **বিহারগুলিই** ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের শুরু হত 'প্রব্রজ্জা' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। 8 বছর বয়সে শিশু প্রব্রজ্জা গ্রহণ করত। প্রব্রজ্জা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের **শ্রমণ** বলা হত। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় গণশিক্ষা (Mass Education) প্রসারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি (Salient Features/Characteristics of Buddhistic System of Education): ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মতো বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থারও

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নীচে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল—

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য (Aims of Buddhistic Education)

অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থারও কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। যেগুলিকে অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাটি এগিয়ে চলত। এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল—

(i) **নির্বাণ ও পরিনির্বাণ লাভ (Achieve Salvation or Nirvana):** বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল 'নির্বাণ' বা 'পরিনির্বাণ লাভ'। দুঃখ জর্জরিত সংসারজীবন থেকে চূড়ান্ত মুক্তির মাধ্যমে নির্বান লাভ করাই ছিল বৌদ্ধশিক্ষার চরম লক্ষ্য।

(ii) **চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ (Attain Ultimate Wisdom):** বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করা। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানকে সংস্কৃতে বলা হত 'অনুত্তর-সম্যক-সমবোধী' (Anuttara-Samyak-Samabhodi) যার অর্থ হল যথাযথ চূড়ান্ত জ্ঞান। বুদ্ধ বলেন, আমাদের সকলের এই চূড়ান্ত জ্ঞানকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে। অতএব এই শিক্ষায় গৌতম বুদ্ধের মতে এই পৃথিবী হচ্ছে দুঃখে পরিপূর্ণ। সমস্ত দুঃখের মূলে রয়েছে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা দূর করার মাধ্যমে চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব।

(iii) **ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন (All round development of Personality):** জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল দিকের যথাযথ পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

(iv) **সুচরিত্র গঠন (Formation of Good Character):** এই শিক্ষাব্যবস্থায় সুচরিত্র গঠনের ওপর বিশেযভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পার্থিব বিষয়বস্তুর মোহ থেকে মুক্ত করে নৈতিকতার শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের সুচরিত্র গঠন করা সম্ভব। এই নৈতিক বিকাশের জন্য বুদ্ধ ৪টি পথ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর কথা বলেছেন যেগুলি অনুশীলন করতে হবে। এই ৪টি পথ হল **সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক জীবিকা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।**

(v) **ধর্মীয় শিক্ষাদান (Impart Religious Education):** বৌদ্ধ যুগে ধর্মকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হত এবং ধর্মের মধ্য দিয়েই শিক্ষাদান করা হত। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মের প্রসারণ এবং ধর্মীয় অনুভূতির অন্তর্ভুক্তিকরণ, যার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ সম্ভব।

(vi) **জীবনের জন্য প্রস্তুতি (Preparation for Life):** এই শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব এবং ব্যাবহারিক শিক্ষাদানও করা হত। যাতে একজন শিক্ষার্থী তার সাধারণ জীবন সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে যাপন করতে পারে।

(vii) **চারটি আর্যসত্যের শিক্ষাদান (Teaching for four Noble truth):** গৌতম বুদ্ধ চারটি আর্যসত্যের কথা বলেছেন। যথা—**জীবন দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবারণ করা সম্ভব, দুঃখ নিবারণের উপায় আছে।** এই চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম মূললক্ষ্য। যার দ্বারা মানুষ এই দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

(viii) এ ছাড়া সেবাধর্ম, বিহার জীবনের ভিক্ষুত্বের প্রস্তুতিদান, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, অহিংসা, সামাজিকতার শিক্ষাদান ইত্যাদিও ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য।

পাঠ্যক্রম (Curriculum)

বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল খুবই উন্নতমানের। প্রথম দিকে পাঠ্যক্রম খুব ব্যাপক বা বিস্তৃত ছিল না। তখন পাঠ্যক্রমে লৌকিক বিদ্যার কোনো স্থান ছিল না। তখন মূলত *ত্রিপিটক*-এর ওপর জোর দেওয়া হত। এই তিনটি পিটক হল— **সূত্ত পিটক, বিনয় পিটক** ও **অভিধর্ম পিটক**। এই ত্রিপিটকে বুদ্ধের জ্ঞান, বার্তা, দর্শন, নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বেদ, পুরাণ, ব্যকরণ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, ছন্দ, ধ্বনি, কাব্য, ইতিহাস, ইন্দ্রজালবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তীকালে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষা, চিত্রকলা, ভাস্কর্যবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারিগরি বিদ্যাকে বৌদ্ধযুগে অবহেলা করা হয়নি। সুতোকাটা, বয়ন শিল্প, সেলাইয়ের কাজও শিক্ষার্থীদের শেখানো হত। এ ছাড়া স্থাপত্য শিল্পের জ্ঞানের দ্বারা তারা নতুন বিহার বা মঠ বানাতে পারত।

সে যুগে শিক্ষাব্যবস্থা দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল— **প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা**। প্রাথমিক স্তরে পঠন, লিখন এবং গণিত (Reading, Writing and Arithmetic) -এর ওপর জোর দেওয়া হত। উচ্চস্তরে ধর্ম, দর্শন, আয়ুর্বেদ শিক্ষা যুক্ত করা হয়। প্রথমদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হলেও পরবর্তীতে পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও শিক্ষাদান শুরু হয়। আরও পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংযুক্ত করা হয়। সেই কারণে এই ভাষাগুলির সম্পর্কেও শিক্ষাদান করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। তবে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রাকৃত ভাষাকে ব্যবহার করা হত।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method)

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত এবং দলগত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে (class room) বিভক্ত হয়ে যায় যা পরবর্তীকালে আরও

উন্নত হয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রথমদিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মূলত মৌখিক। কারণ তখন লিপির ব্যবহার কম ছিল। তাই মুখে মুখে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমদিকে শিক্ষক কোনো বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং শিক্ষার্থীরা তা মন দিয়ে শুনে মনে ধরে রাখত। পরবর্তীতে উপদেশপূর্ণ গল্প, আলোচনা সভা, উপকথা, তর্কবিতর্ক, বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা শুরু হয়। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিতর্ক ও আলোচনা পদ্ধতির এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচার হত। মাঝে মাঝে জ্ঞানীদের সমাবেশ ও আলোচনা চক্র বসত। ভিক্ষুদের সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন হত এবং শিক্ষাকালের সমাপ্তি ঘটত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক দিকের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। যেমন শিক্ষার্থীদের প্রবণতা, মানসিক সামর্থ্য ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে তাদের শিক্ষা দেওয়া হত।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক (Teacher-Pupil Relationship)

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের 'শ্রমণ' বলা হত। শ্রমণ অবস্থায় শিক্ষার্থীকে 20 বছর ধরে বৌদ্ধ সংঘে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে হত। শ্রমণকে ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষায় বেরোতে হত এবং দশটি আজ্ঞা পালনের প্রতিশ্রুতি দিতে হত। যেমন— **মিথ্যা কথা না-বলা, অসময়ে ভোজন না-করা, মাল্য-সুগন্ধি-অলংকার ব্যবহার না-করা** ইত্যাদি। এই কঠোর জীবনযাপন থাকা সত্ত্বেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায় পবিত্র ও মধুর। এই সময় 'উপাধ্যায়' ও 'কর্মাচার্য' নামে দুই শ্রেণির শিক্ষকের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপাধ্যায় শিক্ষার্থীকে বিদ্যা বিতরণ করতেন এবং কর্মাচার্য শিক্ষার্থীকে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। গুরু-শিষ্য উভয়ই পরস্পরের উন্নতি ও সুখসুবিধার জন্য পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করত। শিষ্যরা নানাভাবে গুরুর সেবায় নিয়োজিত থাকত। যেমন, শ্রমণ প্রতিদিন উপাধ্যায়ের মুখ ধোয়ার জল, দাঁতন ইত্যাদি প্রস্তুত করে রাখত। তারপর আসন প্রস্তুত করে, পাত্র পরিষ্কার করে গুরুকে আহার এনে দিত। গুরুর খাওয়া হলে সেই পাত্র ও আহারের স্থান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখত। শিষ্য যেমন গুরুর সেবা করত তেমনই গুরুও শিষ্যের রোগে, শোকে তার পাশে থেকে পিতার মতো দায়িত্ব পালন করতেন। গুরুই যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করতেন।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Noble Eight fold Path)

অষ্টাঙ্গিক মার্গ গৌতম বুদ্ধ দ্বারা বর্ণিত দুঃখনিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিরসনের উপায়। এটি বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা চতুরার্য সত্যের চতুর্থতম অংশ। ত্রিপিটক এবং মহাযানের অংশগুলিতে বলা হয়েছে যে, সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সময় অষ্টাঙ্গিক মার্গকে পুনরাবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলিতে উল্লেখ আছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেকার বুদ্ধরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের চর্চা করেছেন এবং গৌতম বুদ্ধ এই শিক্ষা তার শিষ্যদের দিয়ে গেছেন।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি উপদেশকে সম্যক প্রজ্ঞা, সম্যক শীল বা নৈতিক গুণাবলি এবং সম্যক সমাধি বা ধ্যান এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

1. সম্যক প্রজ্ঞা: সম্যক প্রজ্ঞার মধ্যে দুটি উপদেশ রয়েছে। যথা-সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প।

- **সম্যক দৃষ্টি:** কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের সঠিক জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলে। অহিংসা, চুরি না-করা, অব্যভিচার ও সত্যভাষণ হল কায়িক সুকর্ম। নিন্দা না-করা, মধুর ভাষণ ও লোভহীনতা হল বাচনিক সুকর্ম। মিথ্যা ধারণা না-করা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ না-হওয়া হল মানসিক সুকর্ম। সম্যক দৃষ্টির উদ্দেশ্য হল ভুল, ভ্রান্তি ও মতিবিভ্রম দূর করা। বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের উপায় হল সম্যক দৃষ্টি। অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি হল চারটি আর্যসত্যের যথার্থ জ্ঞান, যা মানুষকে নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়।
- **সম্যক সংকল্প:** মুক্তিলাভের জন্য দৃঢ় সংকল্পে থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধের চারটি আর্যসত্যের জ্ঞানকে নিজ জীবনে পালন করার দৃঢ় নিশ্চয়তাকে সম্যক সংকল্প বলে। নির্বাণ লাভের জন্য ব্যক্তিকে ঐন্দ্রিয় বিষয় থেকে দূরে থাকতে হয়, অন্যের প্রতি দ্বেষ ও হিংসার বিচারকে ত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্প হতে হয়। মোট কথা যা অশুভ তা না-করার সংকল্প হচ্ছে সম্যক সংকল্প। এতে ত্যাগ ও পরোপকারের ভাবনা নিহিত থাকে।

2. সম্যক শীল বা নৈতিক গুণাবলি: সম্যক শীলের মধ্যে তিনটি উপদেশ রয়েছে। যথা- সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা।

- **সম্যক বাক্য:** এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সত্য বলা, মিথ্যা পরিত্যাগ করা এবং বাক সংযম। সম্যক সংকল্পের বাহ্য রূপ হচ্ছে সম্যক বাক্য বা সম্যক বচন। মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, কটুবাক্য ও অতিকথন ত্যাগ করে সত্য ভাষণ ও মধুর বচনকে সম্যক বাক্য বলে।
- **সম্যক কর্ম:** পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল বা সংস্কার এ জন্মে ভোগ করতেই হবে। এ জন্মেও যদি আসক্তিবাহিত ফলভোগের আকাঙ্খা থাকে, তবে পরের জন্মে আবার দুঃখ ভোগ করতে হবে। এজন্য দুঃখের সংসারে পুনর্বার জন্ম না-নিতে হলে মোহ, লোভ, বাসনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করে কর্মপালন করতে হবে। সম্যক কর্মান্তের অর্থ খারাপ কর্মের পরিহার। অহিংসা, চুরি না-করা, অব্যভিচারকে সম্যক কর্ম বলা হয়েছে।
- **সম্যক জীবিকা বা আজীব:** অসৎ পন্থাকে ত্যাগ করে ন্যায়পূর্ণ উপার্জনকে সম্যক জীবিকা বলা হয়েছে। ভোগবাসনা শূন্য হয়ে সৎপথে সৎকর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন হল সম্যক জীবিকা। গৃহী ও সন্ন্যাসী ভেদে সম্যক আজীব ভিন্ন। গৃহী ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও স্বভাব অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু একমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণের পরই নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। অস্ত্র ব্যাবসা, প্রাণী ব্যাবসা, মাংস বিক্রয়, মদ ও বিষের বাণিজ্যকে বুদ্ধ নিষেধ করেছেন এবং এগুলিকে মিথ্যা জীবিকা বলেছেন।

3. সম্যক সমাধি বা ধ্যান: সম্যক সমাধির মধ্যে বাকি তিনটি উপদেশ রয়েছে। যথা- সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

- **সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম:** উপরোক্ত পাঁচটি মার্গ পালন করলেও সাধক নির্বাণলাভে সমর্থ হয় না। কেন-না মানুষের মনে পুরাতন খারাপ বিচার ঘর বেধে আছে এবং নতুন

খারাপ বিচার নিরন্তর মনে প্রবাহিত হতে থাকে। সে কারণে পুরাতন খারাপ বিচারকে মন থেকে নিরসন করা এবং নতুন খারাপ বিচারকে মনে আসা রোধ করা প্রয়োজন। মনকে ভালো বিষয়ে পরিপূর্ণ রাখতে যত্নশীল হতে হয়। সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়ামের অর্থ হচ্ছে ভালো উৎপন্ন করার জন্য সতত উদ্যোগ। এই ব্যায়াম চার প্রকার —

(i) পুরাতন খারাপ বিচারকে মন থেকে বের করে দূর করা।
(ii) নতুন খারাপ বিচারকে মনে প্রবেশ করতে না-দেওয়া অর্থাৎ কুচিন্তার উৎপত্তি দূর করা।
(iii) মনকে সুচিন্তায় নিরত করা অর্থাৎ ভালো ভাব মনে পূর্ণ করা এবং
(iv) এই ভাবকে মনে কার্যকর রাখতে সর্বদা ক্রিয়াশীল হওয়া অর্থাৎ সুচিন্তা উৎপাদনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

অর্থাৎ, এই চতুর্বিধি প্রযত্নের মাধ্যমে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে এবং প্রতিষিদ্ধ কর্মের বর্জনে যে দৃঢ় অধ্যবসায়, তাই হচ্ছে সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম।

- **সম্যক স্মৃতিঃ** সম্যক স্মৃতির অর্থ লোভ, আকাঙ্খা প্রভৃতি থেকে পৃথক থাকা। যে স্মৃতিতে, মনে, অকুশলের চিন্তা উদিত হয় না এবং সর্বদা কুশলকর বুদ্ধি জাগ্রত থাকে তাই হল সম্যক স্মৃতি। দয়া, বেদনা, চিত্ত ও মনের ধর্মের সঠিক স্থিতিসমূহ ও তাদের মনবিধ্বংসী চরিত্রকে সদা স্মরণে রাখাকে সম্যক স্মৃতি বলা হয়।
- **সম্যক সমাধিঃ** রাগ, দ্বেষ বর্জিত চিত্তের প্রচণ্ড একাগ্রতা, যার দ্বারা মনসিক চাঞ্চল্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, তাকেই সম্যক সমাধি বলে। সমাধিতে সাধক নির্বাণ লাভ করেন।

উপসংহার (Conclusion)

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কিছু সুনির্দিষ্ট এবং যুগোপযোগী শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে ছিল এবং উপযুক্ত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা বিশাল খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয় এবং বৌদ্ধ বিহারগুলি ক্রমে মহাবিহারে পরিণত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। যেমন— **নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়** ছিল বৌদ্ধ যুগের উল্লেখযোগ্য দুটি শিক্ষাকেন্দ্র। এ ছাড়াও **বল্লভী, ওদন্তপুরী, জগদ্দল** ইত্যাদিও ছিল বৌদ্ধ যুগের এক-একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। দেখা যায় যে-বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও প্রথমদিকে নারীশিক্ষার স্থান ছিল না। পরবর্তীতে অবশ্য নারীদের বিহারে প্রবেশের অধিকার মেলে এবং নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে থাকে। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের বিহার জীবনের 12 বছর ব্যাপী আবাসিক শিক্ষা 'উপসম্পদা' নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হত এবং শিক্ষার্থীরা বা শ্রমণরা 'উপসম্পদা' উপাধি লাভ করত। সকলদিক পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার যুগ ছিল ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ, যার অবদান বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাতেও বিদ্যমান।